Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 57
January-March, 2019

ইবনে খালদুন ও তাঁর ইতিহাসচর্চার ধারা

Ibn Khaldun and his Method for Study of History

Wayej Kuruni*

ABSTRACT

Ibn Khaldun, one of the leading historians of pre-modern era, is frequently designated as the father of modern sociology, economics, history etc. He devised new science for analysis of society as well as gave birth of innovative ideas providing the finishing touch of investigative history. At the very beginning his works though failed to attract the notice of Muslim scholars many non-Muslim scholars of nineteenth century became world famous by following the path showed by him. It is Ibn Khaldun who for the first time asserted that history like other sciences is also entitled to be the subject of research. This article after sketching the biography of Ibn Khaldun sheds light on the methods employed and followed by him to study history. Moreover, this article also focuses on the rise and decline of states and the theory of Asabiyyah. Above all, a noble effort is exerted here to demonstrate the efficacy of the methods employed by Ibn Khaldun to study history. The author in this paper meticulously tries to explicate that the efficacy of the method devised by Ibn Khaldun to study history encompassing the process to determine truth and falsehood as well as the indispensable qualifications of an historian is beyond controversy even in contemporary period.

Keywords: Ibn Khaldun, science of history, philosophy of history, al-muqaddima, kitab-al-ibar, ilm-al-umran.

সারসংক্ষেপ

ইবনে খালদুন (১৩৩২–১৪০৬ খ্রি.) পূর্বাধুনিক যুগের একজন নেতৃস্থানীয় ইতিহাসবিদ। তাকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিজ্ঞানের জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি সমাজ বিশ্লেষণের জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এছাড়াও তিনি ইতিহাস রচনায় নিয়ে আসেন নতুনত্ব, যার ফলে অনুসন্ধানমূলক ইতিহাস রচনা পূর্ণতা পায়। প্রথম দিকে তার কর্ম মুসলিম পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর অমুসলিম পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই তার দেখিয়ে যাওয়া রাস্তা অনুসরণ করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। ইবনে খালদুনই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, অন্যান্য যে কোনো বিজ্ঞানের মত ইতিহাসও গবেষণার বিষয়। এই প্রবন্ধে ইবনে খালদুনের জীবনী বর্ণনান্তে ইতিহাস চর্চায় তার অনুসৃত ও প্রবর্তিত পদ্ধতির আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এ প্রবন্ধে তার বিখ্যাত 'রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন তত্ত্ব' এবং 'আসাবিয়্যাহ' ধারণা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি এখানে তার প্রবর্তিত ইতিহাস চর্চার পদ্ধতির কার্যকারিতাও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গুণগত ও অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত এ প্রবন্ধে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উপাত্তের সহায়তায় ফলাফলে পৌঁছানোর প্রয়াস পেয়েছি। প্রবন্ধ থেকে স্পষ্ট হয়েছে, ইবনে খালদুন ইতিহাস রচনায় সত্যমিথ্যা যাচাই পদ্ধতি ও একজন ইতিহাসবিদের আবশ্যকীয় গুণাবলি এবং বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে অনুসন্ধানমূলক ইতিহাস রচনার যে পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন তার অবদান ও কার্যকারিতা বর্তমানেও অনস্বীকার্য।

মূলশব্দ: ইবনে খালদুন, ইতিহাসবিজ্ঞান, ইতিহাসদর্শন, আল-মুকাদ্দিমা, কিতাব আল-ইবার, ইলম আল-উমরান।

* Wayej Kuruni is Master of Islamic Studies & an independent researcher, Turkey. email: wayejkuruni@gmail.com

ভূমিকা

আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন পৃথিবীর ইতিহাসে চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করা একজন নেতৃস্থানীয় ইতিহাসবিদ। তাকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলির জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তৎপরবর্তী অমুসলিম পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই তার দেখিয়ে যাওয়া রাস্তা অনুসরণ করে বিশ্ববিখ্যাত হলেও কোনো মুসলিম পণ্ডিত এতটা অগ্রগামী হতে পারেননি। আর্নল্ড টয়েনবি ও রবার্ট ফ্লিন্ট প্রমুখ ঐতিহাসিকদের বিবেচনায় তিনি দেশ, কাল ও পাত্রভেদে সর্বাপেক্ষা চমৎকার ও তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসদর্শনের প্রণেতা। প্লেটো, এরিস্টোটল বা অগাস্টিনও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। ইবনে খালদুন ইসলামী জ্ঞানে যেমন পারদর্শী ছিলেন, একাধারে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জনসংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তার রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুক্বাদ্দিমা বা ভূমিকা। এটি মূলত ১৩৭৭ সালে রচিত তার বিশ্বইতিহাস গ্রন্থ 'কিতাব আল-ইবার' এর মুখবন্ধ। ছয়টি ভাগে বিভক্ত এই 'আল-মুক্বাদ্দিমা' কিতাবে তিনি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে গেছেন এবং যেসব সমস্যা ও

সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে গেছেন, সে কারণে এই ভূমিকা তাকে চিরস্মরণীয় করেছে। এই ভূমিকাটিই তাকে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত করেছে। ইতিহাসকে তিনি বিজ্ঞান হিসেবে দেখিয়েছেন। নির্ভেজাল ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি তার সামনে পরিলক্ষিত হয়েছে তিনি তার কারণ দেখিয়ে সমাধান দিয়েছেন। রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের তত্ত্ব তাকে চিরস্মরণীয় করেছে।

ইতালির দার্শনিক ভিকো (১৬৬৮-১৭৪৪) কে কেউ কেউ ইতিহাসদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করেন, কেউ এক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেন ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫) কে । প্রকৃতপক্ষে ইবনে খালদুনই প্রথম তত্ত্ব পেশ করেন যে, অন্যান্য যে কোনো বিজ্ঞানের ন্যায় ইতিহাসও গবেষণার বিষয়। ইবনে খালদুন সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক 'আর্নল্ড টয়েনবি' (১৮৮৯-১৯৭৫) বলেছেন,

He has conceived and formulated a philosophy of history which is undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any mind in any time or place.

তিনি ইতিহাসের এমন এক দর্শন দাঁড় করিয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে এই ধরনের কাজের মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম, যা কখনো কোথাও আর কারো দ্বারা সৃষ্টি হয়নি'' (Toynbee 1935, 3:321-2, Ahmed, 2002; Katsiaficas, 1999:47).

১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তিউনিসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞানের জগতে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হন তিনি। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি তাকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। জীবনের প্রয়োজনে তিউনিসিয়া থেকে মরক্কো, মরক্কো থেকে গ্রানাডা এবং গ্রানাডা হতে জন্মভূমি তিউনিসে ফিরে এসে পরবর্তীতে মিশরে হিজরত করেছেন। বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে তিউনিসিয়া, মরক্কো ও গ্রানাডার শাসকদের দরবারে তার উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে। যথাযথ সম্মান ও উপযুক্ত পদমর্যাদা না পাওয়ায় কোন কোন সময় তাকে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিকূলে অবস্থান করতে দেখা গেছে। ফলশ্রুতিতে তাকে কারাবাস ভোগ করতে হয়েছে। জীবনের শেষাংশ তার মিসরে কেটেছে। তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করেছেন। ১৪০৬ সালে মিসরেই জীবনাবসান ঘটে এই বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতের।

ইবনে খালদুন তার বিখ্যাত তত্ত্ব 'সভ্যতার উত্থান ও পতনের চক্রের' মাধ্যমে দেখিয়েছেন, কোনো সভ্যতা কতদিন টিকে থাকবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। এভাবে তিনি ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসেবে পরিপূর্ণতা দিয়ে এক নতুনভাবে উপস্থাপন

করেছেন। এ সম্পর্কে কলিন্স বলেছেন ''The ability of a discipline to make valid predictions is a sign of its maturity'' কোনো একাডেমিক ডিসিপ্লিন এর পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায় তখনই যখন তা ন্যায্যতার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে (Collins 1995:1588)। ইবনে খালদুন দেখিয়েছেন, কিভাবে ইতিহাসে মিথ্যাচার প্রবেশ করে এবং কীভাবে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি একজন ঐতিহাসিকের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলিও তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির বর্ণনা যাচাই করে সত্যতা খুঁজে বের করতে হবে তা তার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম আব্দুর রহমান, পিতার নাম মোহাম্মদ। পুরো নাম আবু যায়েদ আব্দুর রহমান বিন মোহাম্মদ বিন খালদুন আল-হাযরামী (Alatas 2006:123)। ইবনে খালদুনের জীবনী তুলনামূলকভাবে তথ্য-সমৃদ্ধ। কারণ তিনি التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا (ইবনে খালদুনের পরিচয় ও প্রাচ্য-পাশ্চত্যে তার সফরনামা) নামে এক আত্মজীবনী রচনা করে গেছেন (Khaldun 1951)। এই আত্মজীবনীতে তাঁর জীবন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু লিখেননি। এ কারণে তার পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে দূরবর্তী কোনো এক পূর্বসূরীর নাম অনুসারে ইবনে খালদুন নামেই পরিচিত হয়েছেন।

জন্ম ও শৈশবকাল

ইবনে খালদুন ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে তিউনিসিয়ার তিউনিস শহরে বনু খালদুন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন উচ্চ-শ্রেণীর আন্দালুসীয় রাজ কর্মকর্তা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তার পূর্বপুরুষগণ 'সেভিলের পতনের' পর তিউনিসিয়াতে হিজরত করেন। তিউনিসিয়াতে তারা হেফসী রাজবংশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তার দাদা ও বাবা রাজনৈতিক জীবন থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। অষ্টম শতাব্দীতে স্পেনে আসা এক ইয়েমেনি আরব গোত্রের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ইবনে খালদুন তার আত্মজীবনীতে নিজ বংশকে আরবদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তার ভাষায়:

ونسبنا في خضرموت من عرب اليمن إلى وائل بن حجر، من أقيال العرب معروف.

আর আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইয়েমেনি-আরবের অন্তর্গত হাযরামাউতে সুখ্যাত ছিল, যাদের বংশপরম্পরা আরবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র পর্যন্ত পৌঁছে (Khaldūn 1951:1-2) ।

শিক্ষা

পরিবার উচ্চস্থানীয় হওয়ার সুবাদে তিনি উত্তর আফ্রিকার তৎকালীন মাগরিবের সেরা পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তিনি শৈশবেই কুরআন মুখস্থ করেন। তিনি প্রথমে শাস্ত্রীয় আরবী ভাষা শিখেন। এরপর কুরআন এবং ইসলামী আইন, হাদীস এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের যথাযথ অনুধাবনের জন্য তিনি কুরআন ও আরবী ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষা করেন। সূফী, গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক 'মুহাম্মদ ইবনু ইব্রাহীম আল-আরবিলী' (১২৮৩-১৩৫৬ খ্রি.)-এর মাধ্যমে তিনি গণিত, যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শনের সাথে পরিচিত হন। তিনি ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, রাজি, আত্-তুসি প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিতদের কিতাব অধ্যয়ন করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে এক ভয়াবহ প্লেগ রোগের মহামারিতে তিনি পিতামাতাকে হারান।

ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পেশাজীবী হওয়ার চেষ্টা করেন। প্রায়শ পরিবর্তনশীল তৎকালীন উত্তর আফ্রিকার (মাগরিব) রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য ব্যাপক দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। ইবনে খালদুন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে অবস্থান করে কখনো জেল খেটেছেন, কখনো শাসকদের অধীনে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেছেন আবার কখনো নির্বাসিত হয়েছেন।

তিউনিস এবং আফ্রিকাতে

২০ বছর বয়সে তিনি তিউনিসিয়ার শাসক ইবনে তাফরাকীন নামক এক সামন্তের অধীনে সাহিবে আলামাহ' বা রাষ্ট্রীয় পত্রের শুরুতে 'আল-হামদু লিল্লাহ' এবং শেষে 'আশ-শুকরু লিল্লাহ' শব্দ লেখার পদে নিযুক্ত হন। এ পদে তিনি ক্যালিগ্রাফি আকারে সরকারি নথির প্রারম্ভিক নোট রাখতেন। ১৩৫২ সালে আবু যিয়াদ তিউনিস দখল করে নিলে তিনি তার শিক্ষক আল-আরবিলীর সাথে মরক্কোর ফেজ নগরীতে হিজরত করেন। সেখানে মারিনিয় সুলতান '১ম আবু ইনান ফারেস' তাকে রাজকীয় ঘোষণাবলি লিখে রাখার দায়িত্বে নিয়েজিত করেন। সুলতানের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার পরও সুলতানের বিরোধী পক্ষের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় সুলতান তার ব্যাপারে সন্দীহান হন এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করেন। এ অভিযোগে তাকে ২২ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৩৫৮ সালে সুলতান আবু ইনান এর মৃত্যু হলে তার উজির হাসান বিন উমর এর দ্বারা ইবনে খালদুনের কারামুক্তি ও পূর্বপদে পুনর্বহাল ঘটে। ইবনে খালদুন পরবর্তী শাসক '৩য় আবু সালেম ইবরাহীম' এর চাচার সাথে যুক্ত হয়ে তাকে উৎখাত করলে তিনি রাজ্যসচিবের পদলাভ করেন। এরপর আবু সালেম এর সিংহাসন হারানোর পর তাকে রাষ্ট্রীয় একটি গুরুত্বহীন পদে নিযুক্ত করা হলে তিনি গ্রানাডাতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইবনে খালদুনের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তার জন্ম হয়েছে ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে। আর ইতিহাস যেন নিজের প্রয়োজনেই ইবনে খালদুনের শিক্ষা, পেশা ও রাজনৈতিক চিন্তার পরিণতিকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

গ্রানাডাতে তিনি পূর্বপরিচিত সুলতান ৫ম মোহাম্মাদের দ্বারা সম্মানিত হন। সুলতান তাকে কাস্টিলার খ্রিস্টান সম্রাট 'পেড্রো দি ক্রুয়েল'-এর কাছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তি করার মিশনে পাঠালে তিনি সফলভাবে তা সম্পন্ন করেন। ইবনে খালদুন তরুণ সুলতান মোহাম্মদকে তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা বিজ্ঞ শাসক হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কারণ, তিনি উজির ইবনুল খতীবের রাজনৈতিক চিন্তাকে বিচারবুদ্ধিহীন ও শান্তির জন্য যথার্থ নয় বলে মনে করতেন। ইতিহাসও এর সত্যতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু সুলতানের সাথে তার ভালো সখ্যতা মেনে নিতে পারেননি উজির ইবনুল খতীব। উজির তার ও সুলতানের মধ্যকার সম্পর্ক নষ্ট করতে নানাবিধ চক্রান্তের আশ্রয় নেয়। ফলে স্বয়ং সুলতানও তার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাতে থাকে। ইবনে খালদুন এ সময় চরম মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে থাকেন। এ ক্রমবর্ধমান মানসিক অস্বস্তির সময় তার পুরাতন বন্ধু আবু হেফসী পরিবারের আব্দুল্লাহর কাছ থেকে আমন্ত্রণ লাভ করেন। আবু আব্দুল্লাহ ১৩৬৪ খ্রি. পুনরায় বুগির শাসনক্ষমতা লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, এই আবু আব্দুল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের কারণে ইবনে খালদুন ফেজে দীর্ঘদিন কারাবাস করেছিলেন।

রাজনৈতিক উচ্চপদে

কারাসঙ্গী হেফসী সুলতান আবু আব্দুল্লাহ এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি বগিতে চলে আসেন। সুলতান তাকে সাদরে গ্রহণ করে তাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করেন। এই সময়ে ইবনে খালদুন স্থানীয় বার্বারদের কাছ থেকে কর আদায়ের মত দু:সাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৩৬৬ সালে আবু আব্দুল্লাহর মৃত্যুতে তিনি আরেকবার রাজনৈতিক পক্ষ পরিবর্তন করেন। তিনি তেলমেসেনের শাসক আবুল আব্বাসের সাথে জোটবদ্ধ হন এবং রিয়াহ ওয়াদিয়া বেদুইনদের মধ্যে কাজ করার জন্য বিস্করা চলে যান। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ ছিল। তিউনিস, তিলমিসান, বুগি ও কুস্তানতুনিয়ার শাসকবর্গ প্রত্যেকেই বিস্কারার এ অঞ্চলটি নিজ আয়ত্তে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষত তিলমিসানের শাসক আবু হাম্মু ও বগির শাসক আবুল আব্বাসের মধ্যকার বিরোধ ছিল স্পষ্ট। এমনই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনীতিতে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। মারিনী যুবক আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে পুনরায় এ সাম্রাজ্যের জাগরণ দেখা দেয়। তিনি ফেজের নতুন শাসক হিসেবে ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে তিলমিসান আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। পূর্বতন মারিনী সম্রাট আবু সলিমের মৃত্যুর পর ফেজ ত্যাগ

করার সময় মারিনীদের সাথে ইবনে খালদুনের সম্পর্কের যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণে মারিনী বংশের পুনরুত্থানে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পুনরায় স্পেনে আশ্রয় নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। স্পেনে যাওয়ার পথে হুনাইন বন্দরে সম্রাট আব্দুল আযীযের সৈন্যদের হাতে ধৃত হন। তবে তাকে এ যাত্রায় বন্দী করা হয়নি। পরদিন সকালেই তিনি মুক্তি পান এবং তিলমিসানের নিকটবর্তী 'আল-উব্বাদ' এ যেয়ে পৌঁছান। কিন্তু সম্রাট আব্দুল আযীয তাকে আবার রাজকীয় পদমর্যাদায় ভূষিত করে বিস্করার বেদুইনদের মধ্যে কাজ করার নির্দেশ দেন। ফলে তিনি ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট বিস্করায় চলে আসেন।

পুনরায় গ্রানাডায়

১৩৭২ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল আযীযের মৃত্যুতে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুনরায় ইবনে খালদুনের প্রতিকূলে চলে যায়। ফলে তিনি পুনরায় গ্রানাডায় আশ্রয় নিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু ফেজের নতুন শাসকরা তাকে দেশ ত্যাগের অনুমতি প্রদান করেননি। অবশেষে ১৩৭৪ খ্রি. পরিবার-পরিজন ব্যতীত শুধুমাত্র একা গ্রানাডায় যাওয়ার অনুমতি পান। ইতঃমধ্যে গ্রানাডার শাসকেরও পরিবর্তন হয়েছে। নতুন শাসক ইবনে আহমর ও নতুন প্রধানমন্ত্রী ইবনে জামরাক ইবনে খালদুনকে স্বাগত জানায়। কিন্তু বেশিদিন অতিবাহিত না হতেই ফেজের শাসকদের পক্ষ থেকে গ্রানাডার রাজদরবারে ইবনে খালদুনকে ফেরত দেয়ার অনুরোধ সম্বলিত একটি পত্র পৌঁছায়। কিন্তু তারা তাকে ফেজে ফেরত না পাঠিয়ে আফ্রিকায় প্রেরণ করেন।

আবারও আবু হাম্মুর কাছে

গ্রানাডা থেকে ফেরত এসে ইবনে খালদুন যখন হুনুইন বন্দরে অজানা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন তখনই তার পূর্ব বন্ধু বনি আরিফ গোত্রের প্রধান মুহাম্মদ ইবন আরিফের সাথে দেখা হয় এবং তার সহায়তায় শেষ পর্যন্ত তিনি আবু হাম্মুর দরবারে উপস্থিত হন। আবু হাম্মু তখন পুনরায় তিলমিসানের ক্ষমতা দখল করেন। ইবনে খালদুন তার অনুমতি নিয়ে 'আল-উব্বাদ' এলাকায় বসবাস শুরু করেন এবং কিছুদিন পর তার পরিবার পরিজনও এখানে এসে তার সাথে মিলিত হন। এমতাবস্থায় তিনি ১৩৭৫ সালে তেলমেসানের সুলতান আবু হাম্মুর পক্ষ থেকে 'দাওয়াইয়া' গোত্রে প্রেরিত হন।

জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা

আল-উব্বাদ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে দাওয়াইয়া গোত্রে কাজ করার জন্য রওনা হন এবং বনী আরিফের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি ক্বালাত ইবনে সালামা

দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে তিনি অপেক্ষাকৃত স্বস্তি ও প্রশান্তচিত্তে তাঁর কিতাবুল ইবারের ভূমিকা অর্থাৎ 'আল-মুক্বাদ্দিমা' রচনা করেন, যা তার বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থের সূচনা। রচনাকর্ম সমাপ্ত করার জন্য ইবনে সালামাতে পর্যাপ্ত বই-পুস্তক না পাওয়ায় তিনি ১৩৭৮ সালে তিউনিসে ফিরে আসেন।

তিউনিস থেকে মিসর

তিউনিসের সুলতান আবুল আব্বাস স্বপরিবারে তিউনিসে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল নিজ জন্মস্থান ও কৈশোরের লীলাভূমি তিউনিসে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিবেন। তিনি অন্তর থেকে চেয়েছিলেন রাজকীয় সমস্ত পদমর্যাদা এড়িয়ে তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করবেন। এজন্য তিনি তিউনিসে এসে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। অতি অল্প দিনেই তিনি তিউনিসের শিক্ষা পরিবেশে নিজের বিশিষ্টতা প্রমাণ করেন। এ কারণে সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গ অচিরেই তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়। অন্যদিকে রাজ দরবারের কিছু আমলা তাঁর বিরুদ্ধে সম্রাটকে বিষিয়ে তোলে। এ দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর আমৃত্যু তিউনিসে থাকার ইচ্ছা সফল হয়নি। ফলে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যাওয়ার কথা বলে ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিউনিস ত্যাগ করে মিশরে চলে যান।

মিশরে জীবনের শেষ দিনগুলো

কায়রো তার হৃদয়কে যথেষ্ট আকর্ষণ করলেও সেখানে তাকে সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হয়। ইবনে খালদুন মিসরে পৌঁছানোর কিছুদিন পূর্বে সেখানে নতুন সম্রাট মালিক যহীর বারকুক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। স্বভাবতই তিনি তাঁর সভাসদগণের গুণগত মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নতুন মনীষা ও ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধানে ছিলেন। ইবনে খালদুনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ইবনে খালদুনের প্রতি তাঁর বদান্যতায় তিনি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা ও প্রধান বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। মিসরে প্রবেশের পর ইবনে খালদুন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। তাঁর এ জ্ঞানচর্চার মজলিস আস্তে আস্তে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট বারকুক তাকে ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কৌমিয়া মাদরাসার মালিকী ফিকহ শাস্ত্রের অধ্যাপক নিয়োগ করেন। এছাড়াও তিনি জাহিরিয়া মাদরাসা, সারগাতমিশিয়া মাদরাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। তিনি মালিকী মাযহাবের প্রধান বিচারক পদে নিযুক্ত হন (তৎকালীন মালেকী মাযহাব সমগ্র উত্তর আফ্রিকাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল)। সংস্কারমূলক কার্যক্রমে বিরোধিতার স্বীকার হয়ে অবশেষে তিনি এক

বছরের মধ্যে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি নেন। এ পদে তিনি কয়েকবার অধিষ্ঠিত হন ও তা থেকে বিচ্যুত হন। ১৩৮৪ সালে জাহাজ ডুবিতে তার সন্তানসন্ততি সহ স্ত্রী নিহত হন। এমন মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ১৩৮৭ খ্রি. তিনি হজ্জ করতে মক্কা যান। ১৩৮৮ সালে তিনি হজ্জ থেকে ফিরে কায়রোর বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষার সাথে পুরোপুরিভাবে যুক্ত হন। ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাইবার মাদরাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

তৈমুর লং এর বিরুদ্ধে অভিযান এবং সন্ধি স্থাপনে মধ্যস্থতা

মিসরে অবস্থানকালীন ১৪০০ সালে মধ্য এশিয়া বিজেতা সম্রাট তৈমুর লং আলেপ্পো জয় করে দামেশকের দিকে অগ্রসর হয়। মিসরের নতুন সুলতান নাসির আল-ফেরাজের পক্ষ থেকে তিনি সামরিক অভিযানে অংশ নিয়ে দামেশক যেতে অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি এই অভিযানের সফলতার ব্যাপারে সন্দিহান থাকায় মিসর ত্যাগ করে দামেশক যেতে চাননি। মিসরে বিদ্রোহের আশংকায় সিরিয়াতে সেনাবাহিনী রেখে তরুণ সুলতান মিসরে ফিরে গেলে তিনি অবরুদ্ধ নগরে সাত সপ্তাহ অবস্থান করেন। তিনি তৈমুরের সাথে মধ্যস্থতার জন্য অনেকগুলো বৈঠক করেন, যা তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন। তৈমুরের অনুরোধে তিনি মাগরিব সম্পর্কে এক বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেন। পাশাপাশি তিনি তাতারদের ইতিহাস এবং তৈমুরের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক তথ্যাদি সহকারে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ফেজে মেরিনীয় শাসকদের কাছে পাঠান।

এরপরের বাকি ৭ বছর তিনি কায়রোতে অতিবাহিত করে তার আত্মজীবনী ও বিশ্ব ইতিহাস রচনা সমাপ্ত করেন। ১৪০৬ সনে ৭৪ বছর বয়সে মিসরে তার মৃত্যু হয়। (Ahmed 2002: 101-104).

রচনাকর্ম

ইবনে খালদুন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব আল-ইবার' ছাড়াও আরো কিছু রচনাকর্ম রেখে গেছেন। কিন্তু তিনি তার আত্মজীবনীতে এসব বিষয় উল্লেখ করেননি। এর কারণ হতে পারে যে, কিতাবুল ইবার এর লেখক হিসেবে মানুষ তাকে ইতিহাসবিদ হিসেবেই জানুক। তবে অন্যান্য সূত্র হতে জানা যায় যে, তিনি উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে অবস্থানকালীন মাত্র ১৯ বছর বয়সে ধর্মতত্ত্বের উপর তার প্রথম গ্রন্থ لباب المحصل (লুবাবুল মুহাস্‌সাল) রচনা করেন। ফেজে থাকাকালীন সুফিজমের উপরে তিনি شفاء السائل لتهذيب المسائل (শিফাউস সাইল লিতাহজীবিল মাসাইল) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন । গ্রানাডাতে অবস্থানকালে তিনি যুক্তিবিদ্যার উপরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে খালদুনের ইতিহাস চর্চার ধারা

ইসলামী সংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চা ঐতিহ্যগতভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইবনে খালদুনের ইতিহাসবিজ্ঞান আবিষ্কারের পূর্বে ইতিহাস তিন পদ্ধতিতে রচিত হতো। ১. সীরাত, এটি এক প্রকারের মৌখিক ইতিহাস, যা নবী স. এর হাদীসে প্রতিফলিত হয়েছে। হাদীস বর্ণনা এমন এক পদ্ধতি যা কথা আকারে বর্ণিত ও মুখস্থ করে সংরক্ষণ করা হতো। লিখিত রূপ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্র এই পদ্ধতিতে চর্চা করা হতো। ২. তাবাক্বাত, এটি আরবী তাবাক্বাহ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে- স্তর বিন্যাশ ৩. তারিখ, এটিই ঐতিহাসিক বর্ণনার প্রতিষ্ঠিত ও সর্বাধিক স্বীকৃত রূপ। ইবনে খালদুন এই তৃতীয় প্রকারকে বেছে নিয়েছেন।

১৩৭৭ ঈসায়ী সনে ইবনে খালদুন '(Kitāb al-'ibar wa-dīwān al-*mubtada'* wa-al-khabar fī *ayyām* al-'Arab wa-al-*'Ajam* wa-al-*Barbar' সংক্ষেপে 'কিতাব আল ই'বার'* (শিক্ষণীয় গ্রন্থ) নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে আরবদের ইতিহাস, সমসাময়িক মুসলিম ও অমুসলিম ইউরোপীয় শাসকদের ইতিহাস, আরব, ইহুদী, গ্রিক, রোমান, পার্সিদের প্রাচীন ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস, বার্বার ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বসবাসকারী গোত্রগুলোর ইতিহাস গ্রন্থিত হয়েছে। তবে 'আল-মুক্বাদ্দিমা' তার রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ, যা তাকে বিশ্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছে। এটি *'কিতাব আল-ইবার'* এর ভূমিকা; কিন্তু কলেবরে দীর্ঘ হওয়ায় আলাদা গ্রন্থ আকারে পরিচিতি পেয়েছে। এটি ইতিহাসদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের সেরা মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য হলো মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক কারণসমূহ চিহ্নিত করা, যেগুলো মানবসভ্যতার ইতিহাসের ধারা অব্যাহত রাখতে ভূমিকা রাখে। ৬টি অধ্যায় বা অংশে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এই ৬টি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে তিনি একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্বাবস্থা থেকে শুরু করে পতন পর্যন্ত ধাপগুলো দেখিয়েছেন।

১ম অধ্যায়ে: মানবসভ্যতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে।

২য় অধ্যায়: গ্রামীণ জীবন, যাযাবরী জীবন, বর্বর জাতি ও উপজাতি ও তাদের জীবনান্তর্গত বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায়: সরকারের ধরন সম্পর্কিত। এ অধ্যায়ে সাধারণ সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রশক্তি, খেলাফত ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিভিন্ন পদমর্যাদা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়: নগর সভ্যতার সমাজ সম্পর্কিত। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশ ও নগরী, সমগ্র মানব সভ্যতা এবং এর আগত ও অনাগত অবস্থাসমূহ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫ম অধ্যায়: অর্থনৈতিক বিষয়াবলি। এই অধ্যায়ে জীবিকা উপার্জন, বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশা ও এগুলোর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়: বিজ্ঞান ও মানবতা। এ অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি গোষ্ঠীগত সম্পর্কের গতিবিদ্যাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে এই গোষ্ঠীচিন্তা বা 'আল-আসাবিয়্যাহ' থেকে নতুন সভ্যতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সূচনা হয়। তিনি মানবসভ্যতার উত্থান ও পতনের পুনরাবৃত্তি কিভাবে ঘটে এবং এর নেপথ্যে কী কী কারণ কাজ করে তা চিহ্নিত করেছেন।

ইবনে খালদুন উপলব্ধি করেছেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ ও প্রকৃতি বুঝতে হলে সঠিক তথ্য পাওয়া এবং প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করার সক্ষমতা থাকা জরুরী । (Abdallah 2016: 2) অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসবিজ্ঞানের বাইরে ইতিহাসকে নিছক গল্প-কাহিনী হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এবং এর মূলনীতি, পদ্ধতি, বিষয়বস্তু এবং ফলাফল নির্ণয়ের জন্য তিনি এক নতুন বিজ্ঞানের আবিষ্কার করতে আগ্রহী হন। দু'বছর চিন্তা-গবেষণা করে তিনি এক নতুন ডিসিপ্লিন এর আবিষ্কার করেন, যাকে তিনি 'সায়েন্স অব কালচার' বলে নামকরণ করেন। (Mahdi: 2006: 50)।

বাস্তবতা বিবর্জিত ঘটনা বর্জন করে অনুসন্ধানভিত্তিক ইতিহাসের সূচনা

ইবনে খালদুন ইতিহাসকে শুধুমাত্র ঘটনা বা শাসকগোষ্ঠীর নামের তালিকা আকারে লিপিবদ্ধ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি দেখিয়েছেন, পাশাপাশি অতীতের ঘটনার আলোকে কোনো সমাজ অথবা রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয় করা। কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অবস্থা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সামগ্রিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্যই ইতিহাস। তিনি একাধিক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসে কিভাবে তথ্যের অসংগতি ও মিথ্যাচার প্রবেশ করে থাকে। আল-মাস'উদী (৮৯৬- ৯৫৬) সহ বহু আরব ইতিহাসবিদ মুসা আ. এর একটি ঘটনায় ভুল ও অযৌক্তিক সৈন্যসংখ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা ইবনে খালদুন খুব সহজ যুক্তি দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। মুসা আ. একটি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অহীর মাধ্যমে আদিষ্ট হন তখন তার সম্প্রদায় বনী ইসরাইলী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছয়

লক্ষেরও অধিক পেয়েছেন। যদি এ বিষয়টি সতর্কতার সাথে যাচাই করা হয় তাহলে দেখা যাবে, এ তথ্যটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। এক্ষেত্রে দেশের ভূখণ্ডের আয়তন, ব্যয়ভার বহন ও সক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এত বিপুল সংখ্যক সৈন্যদের নির্দেশনা দিয়ে কোথাও যুদ্ধ করতে যাওয়া, কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করা কিংবা যুদ্ধ পরিচালনা করা অসম্ভব। তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল অনেক বেশি। পারস্যের একটি অঙ্গরাজ্যের শাসক বুখতেনসর বনী ইসরাইলে হামলা করে জেরুজালেমসহ সর্বত্র হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে। অথচ বনী ইসরাইলের এতবড় বাহিনীকে পরাজিত করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে। পারস্যের সেনাবাহিনী পরবর্তীকালে যখন মুসলমানদের মুখোমুখি হয় তখন তাদের সংখ্যা মাত্র এক লক্ষ বিশ হাজার ছিল। অপরদিকে মুসা ও ইয়াকুব আ. এর মধ্যে মাত্র ৪ প্রজন্ম পার্থক্য। ইয়াকুব আ. যখন তার আত্মীয় পরিজন নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেন তখন তারা ছিলেন মাত্র ৭০ জন। তাহলে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে মুসা আ. এত সৈন্য সংখ্যা কোথায় পেলেন। ইসরাইলী বর্ণনা মতে, সোলায়মান আ. এর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১২,০০০ আর ঘোড়া ছিল মাত্র ১,৪০০। আর সোলায়মান আ. কে বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে প্রতাপশালী বাদশাহ। সবচেয়ে প্রতাপশালী বাদশাহর চেয়ে দশগুণ সৈন্যসামন্ত বনী ইসরাইলদের ছিল অথচ অন্য কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থে এর উল্লেখ থাকবে না এটি মেনে নেয়া কঠিন। (Masudi 1861: 77, Khaldun 1958: 16-17)

ইতিহাসের শ্রেণীবিভাগ

তিনি ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন : ১. বাহ্যিক রূপ ২. অন্তর্নিহিত রূপ

১. বাহ্যিক রূপ

এটি হলো অতীতের ঘটনার বর্ণনা। অতীতের রাজা-বাদশাহদের জীবনী, যুদ্ধ, গল্প ও কল্পনা আশ্রিত বিবরণ, রাজাদের বংশ-পরম্পরা, স্তুতি এবং প্রতিপক্ষের কুৎসা রচনা। এ ধরনের ইতিহাসে সংখ্যা ও সালের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এতে কোনো ঘটনার পেছনের অন্তর্নিহিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণগুলো উল্লেখ থাকে না। এসব ইতিহাস রচনা করা হয়, শাসকদের অনুগত লেখকদের দিয়ে তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য। মনগড়া এসব ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠকদেরকে অন্ধকারে রেখে ক্ষমতায় চিরস্থায়ী হয়ে বসে থাকার ব্যবস্থা করে ক্ষমতালোভী শাসকশ্রেণী।

২. অন্তর্নিহিত রূপ

অন্তর্নিহিত রূপ হলো পৃথিবীর ইতিহাসের ভেতরকার রূপ। ইবনে খালদুন ইতিহাসকে দর্শনের মূল শাখা হিসেবে উল্লেখ করে ইতিহাসের দর্শন নামে এক নতুন দর্শনের সন্ধান দেন। পরবর্তীতে তার রাস্তা ধরেই অনেক ধারা উপধারা তৈরি করেন ভিকু, হেগেল, মার্কস, ডারউইন, গীবন, ই বি টেইলর, স্পেনসার ও আরো অনেকে। তিনি বাহ্যিক রূপ অপেক্ষা অন্তর্নিহিত রূপকেই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ গণ্য করতেন। এতে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির কারণ, বিকাশ ও বিনাশের স্বরূপ উদঘাটিত হয়। (Khaldun 1958: 6)

ইবনে খালদুনের মতে,

"প্রকৃত ইতিহাস আমাদেরকে মানব সমাজের জীবন সম্পর্কে ধারণা দেয়, যা বিশ্বের পরিবেশ ও পরিবেশের প্রকৃতি যা বিভিন্ন ঘটনার কারণে আবির্ভূত হয়। এটি সভ্যতা, বর্বরতা উপজাতীয়তাবাদ প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করে, যার মধ্যে মানুষ পরস্পরের উপর ক্ষমতাসীন হয় এবং রাষ্ট্রের ও এর উচ্চ-নিম্ন ধরনের পেশা, জীবনযাত্রা, বিজ্ঞান, হস্তশিল্প এবং ওই পরিবেশে যা কিছু সম্পন্ন হয় তার সব কিছু নিয়েও কাজ করে" (Khaldun 1967: NP)। ইবনে খালদুন ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে যাচাইবিহীন হওয়া অপছন্দ করতেন। তিনি এক্ষেত্রে 'শুনেই বিশ্বাস না করা' নীতির অনুসরণ করতেন। ইতিহাসের ঘটনা এবং কথা যাচাই-বাছাই করার জন্য এই পন্থা যথার্থ ছিল।

নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন

ইতিহাস হলো পৃথিবীর জানালা, যা দিয়ে পৃথিবীর অতীতকে দেখা যায়। ইবনে খালদুন ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। সমাজকে যথাযথভাবে পাঠ করতে গিয়ে ইবনে খালদুন একটি বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেন, যাকে (علم العمران البشري/The science of human social organisation) আবার কোন কোন স্থানে (علم الاجتماع الإنساني/ The Science of Human Society) বলে নামকরণ করেছেন (Alatas 2006)। এই 'ইলম আল উমরান' ই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক রূপ, আর ইবনে খালদুন এই বিজ্ঞানের জনক। এই বিজ্ঞান পণ্ডিতদেরকে ঐতিহাসিক দাবির সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ দেয়। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর সত্যতা যাচাই (Rectification) করা তার মূল লক্ষ্য ছিল। যা শুধু ইতিহাসবিজ্ঞানের মধ্যেই নয়; বরং অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন হাদীস, তাফসীর এবং ফিক্‌হ প্রভৃতি মৌলিক ডিসিপ্লিনে প্রয়োগ করাও তার উদ্দেশ্য ছিল। (Çaksu 2017, 14)

ইতিহাস পাঠের জন্য তিনি তুলনা, তাত্ত্বিক অনুধাবন এবং ঐতিহাসিক ঘটনার প্রকৃতি ও কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন-(Mahdi: 2006:70-71)। সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানীগণ এ কারণে অকপটে স্বীকার করেন যে, তিনিই সংস্কৃতিক বিজ্ঞানের জনক। Katsiaficas উল্লেখ করেছেন, Four hundred years before Auguste Comte, Ibn Khaldun unveiled his 'science of culture' (অগাস্ট কোথ এর ৪০০ বছর পূর্বে তিনি 'সংস্কৃতির বিজ্ঞান' আবিষ্কার করেন) (Katsiaficas, 1999, 46). তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস-বিজ্ঞান ছিল সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের বিজ্ঞান। তিনি এনালস বা গতানুগতিক বর্ষপঞ্জি ও ইপিসোডিক্যাল হিস্ট্রি বা কাহিনীমালার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সন, রাজবংশ ও শাসকদের তালিকাভিত্তিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতিকে বাদ দেন।

দু'টি মানদণ্ড ও চারটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

ইবনে খালদুনের বৈপ্লবিক চিন্তা মুসলিম পণ্ডিতদের পাশাপাশি পশ্চিমা চিন্তাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলিকে কারণ এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম এ দুটি মৌলিক মানদণ্ডে পরিমাপ করেছেন। এছাড়া তিনি ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলিকে অধ্যয়ন ও বিচার-বিশ্লেষণের জন্য ৪টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ১. কারণ ও ফলাফল (Cause and Effect) এর দ্বারা ঘটনাগুলিকে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। ২. অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তুলনা করা। ৩. ঘটনার উপর পরিবেশের সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করা। ৪. পূর্ববর্তী ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব বিবেচনা করা।

ইতিহাসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তিনি চারটি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন

ইবনে খালদুনের পদ্ধতি সমালোচনা, পর্যবেক্ষণ, তুলনা এবং যাচাই-বাছাই এর উপর ভিত্তি করে চলে। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক সমালোচনা করতেন। ঘটনাগুলি বর্ণনার সূত্র এবং ইতিহাসবিদগণের অনুসৃত কৌশল, প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছে, তা জানার জন্য তিনি বিভিন্ন ঘটনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরস্পরের মধ্যে তুলনা করতেন। যাতে মিথ্যাচার ও অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত ঘটনার উদ্দেশ্য বের করতেন। অনেক ঘটনার মধ্যে মিথ্যাচার পাওয়া যেত। কারণ তা শাসকশ্রেণীকে তোষামোদ করে অথবা কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থে (যাকে তিনি 'আসাবিয়্যাহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন, এটি এক ধরনের জাতীয়তাবাদ) অথবা খবর ও গল্পকথকেরা নিজেদের স্বার্থে সজ্ঞানে মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রতারণা করে থাকে। এ কারণে ইবনে খালদুন ইতিহাসবিদদের প্রতি অনুরোধ করেছেন, যেন তারা

গভীর জ্ঞানের মাধ্যমে নির্ভুল পর্যবেক্ষণ, দক্ষতার সাথে লেখা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনা করেন; তবেই তারা ইতিহাসের যথাযথ সমালোচনা ও নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সফল হতে পারবেন (Jubouri 2004: 418) (Muhammed Hüseyin Mercan 2016: 30)

একজন ইতিহাসবিদের আবশ্যকীয় যোগ্যতাসমূহ

ইবনে খালদুন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একজন ইতিহাসবিদের জন্য আবশ্যকীয় যোগ্যতার মাপকাঠি তৈরী করেছেন। তা নিম্নরূপ:

১. সম্যক রাজনৈতিক জ্ঞান এবং মানব প্রকৃতি অনুধাবন ক্ষমতা

২. প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং স্থান-কাল ভেদে এর ভিন্নতা।

৩. বিভিন্ন জাতির সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান- এর জীবনধারা, নীতি-নৈতিকতা, উপার্জন, মতবাদসমূহ।

৪. বর্তমান সময় সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান এবং অতীতের সাথে তুলনা করার সক্ষমতা।

৫. রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়সমূহের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত জ্ঞান, এসবের ঘোষিত নিয়ম-নীতিমালা ও ইতিহাসের মূল ঘটনাবলি (Jubouri 2004: 420-21)।

নির্ভেজাল ইতিহাস বাছাইয়ের জন্য ইতিহাসে মিথ্যাচার প্রবেশের কারণ নির্ণয়

মিথ্যা তথ্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে কলুষিত করে। ইবনে খালদুন তার আল-মুক্বাদ্দিমা গ্রন্থে বেশ কিছু কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ১. কোনো বিশেষ মত অথবা মতবাদের প্রতি আনুগত্য। যদি কেউ তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে তাহলে সে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ছাড়া তথ্য গ্রহণ করে না। অন্যথা হলে মিথ্যা তথ্য গ্রহণ ও বর্ণনা করা হয়। ২. (তদন্ত ও যাচাই না করে) বর্ণনাকারীর বর্ণনার উপর (পুরোপুরিভাবে) নির্ভর করা। ৩. ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। অনেক বর্ণনাকারীই তার বর্ণিত ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে না জেনে শুধু মৌখিকভাবে ঘটনা বাড়িয়ে বলে। এতে ইতিহাসের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। ৪. প্রকৃত সংখ্যা বা পরিমাণের চেয়ে বাড়িয়ে বলা। এর সত্যতা বর্ণনাকারীর উপর নির্ভর করে। অর্থ ও সৈন্যসংখ্যার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি বেশি ঘটে থাকে। ৫. বাস্তবতার সাথে বর্ণিত ঘটনার সংগতি সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব। ৬. শাসকশ্রেণীর তোষামোদ করা। ৭. উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসত্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা এবং এটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ (Khaldun 1958: 14-17) ।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করে নতুন তত্ত্ব প্রবর্তন

আসাবিয়্যাহ ও রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের চক্র তত্ত্ব

আসাবিয়্যাহ (عصبية) শব্দটি আরবী শব্দ। ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষায় এর যথাযথ প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তবে এর কাছাকাছি অর্থ গোত্রপ্রীতি। 'আসাবিয়্যাহ' বলতে "সর্বাবস্থায় তার নিজের লোকদেরকে সমর্থন করা, সেটা ন্যায্য-অন্যায্য আর জালিম-মজলুম যাই হোক। নিজের লোক বলতে তার আত্মীয়স্বজন, গোত্র, বর্ণ, জন্মস্থান, নাগরিকত্ব, মাজহাব অথবা একই রকম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে এমন মানুষের দল" (Hawker 2006:108)। এই বিবেচনা থেকে দেখলে 'আসাবিয়্যাহ' কে উগ্র জাতীয়তাবাদ (chauvinism) এর সমপর্যায়ের ধরা যায়। নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধারণা করা থেকে এর সূত্রপাত হতে পারে।

তবে ইবনে খালদুন 'আসাবিয়্যাহ' শব্দটিকে প্রচলিত শাব্দিক অর্থ থেকে বের করে এনে এমন এক অর্থে দাঁড় করিয়েছেন, যার যথাযথ সমার্থক কোনো প্রতিশব্দ ইংরেজি অথবা অন্য কোনো ভাষায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'আল-মুক্বাদ্দিমার ইংরেজি অনুবাদক রোজেনথাল শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন group feeling (সামষ্টিক অনুভূতি)।

কেউ কেউ 'Social Solidarity (সামাজিক সংহতি)' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন (Issawi:1987)। তবে ল্যাকোস্টের মতে, যারা দেশপ্রেম অথবা জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি অর্থে ব্যাখ্যা করেন তাদের মনে রাখা উচিৎ, শব্দটির উৎপত্তি কালের দিকে। উত্তর আফ্রিকা ও অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রকে উপজীব্য করে 'পরিভাষাটি'র উদ্ভব হয়েছে তখনকার সময়ের জন্য এসব শব্দ অনেক বেশি আধুনিক কালের (Lacoste: 1984)। একারণেই কতক স্কলার 'আসাবিয়্যাহ' পরিভাষাটি সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন, আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো, ইবনে খালদুনের লেখনী হতেই এর যথাযথ অর্থ অনুসন্ধান করা।

একই রক্ত, বংশ, চিন্তা-ভাবনা, ধর্ম ও সমগোত্রীয়দের মধ্যে বন্ধনের যে দৃঢ়তা থাকে ইবনে খালদুন এই সংহতি কে 'আসাবিয়্যাহ' পরিভাষায় অভিহিত করেছেন। তার মতে নগরবাসীর তুলনায় পাহাড়ী অঞ্চল, বেদুইন ও গ্রামের মানুষের মধ্যে আসাবিয়্যাহ বেশি থাকে। বর্ণিত অঞ্চলের অধিবাসীরা যখন শহরে বসবাস করতে শুরু করে তখন তাদের মধ্যে আসাবিয়্যাহ কমতে থাকে। শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার তিন থেকে চার প্রজন্ম পর্যন্ত টিকে থাকে। চতুর্থ প্রজন্মে এক পর্যায়ে 'আসাবিয়্যাহ' পুরোপুরিভাবে ভেঙে যায় এবং তারা শাসনক্ষমতা হতে বিচ্যুত হয়।

ইবনে খালদুন ইসলামের মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উমাইয়া খেলাফতের পতন পর্যন্ত (৬৩২-৭৫০ খ্রি.), আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠা হতে পতন পর্যন্ত (৭৫০- ১২৫৮ খ্রি.) ইসলামের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'আসাবিয়্যাহ'-র অন্য সকল ভিত্তি অপেক্ষা ধর্মীয় কারণটি বেশি শক্তিশালী। সুতরাং ধর্মভিত্তিক কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকশ্রেণী ও জনগণ উভয়েই যদি ধর্মীয় রীতিনীতিতে অটল থাকে, তাহলে এই সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমনকি তা ইবনে খালদুনের 'ক্ষমতা সাধারণত এক শতাব্দী তথা তিন প্রজন্ম স্থায়ী হয়' এ তত্ত্ব অতিক্রম করে আরো দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো উসমানী সালতানাত (১২৮৮-১৯২৩ খ্রি.)।

ইবনে খালদুনের মতে একটি রাজবংশ (Dynasty) সর্বোচ্চ তিন প্রজন্ম (১২০ বছর) পর্যন্ত টিকে থাকে। এই তিন প্রজন্মের পর নতুন রাজবংশ (Dynasty) শাসন ক্ষমতায় আসে। রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের চক্রকে ইবনে খালদুন পাঁচটি ধাপে ভাগ করেছেন। তিন থেকে চার প্রজন্মে একটি চক্র শেষ হয়ে যায়।

প্রথম ধাপ 'আসাবিয়্যাহ' (group feeling): এটি হলো প্রতিষ্ঠার সময়। পারিবারিক বন্ধন, একই রক্ত, বংশ, চিন্তা-ভাবনার মিল এবং ধর্ম ও অন্যান্য সমজাতীয়তার ভিত্তিতে সমাজে মানুষ 'আসাবিয়্যাহ' গোষ্ঠীচিন্তা (group feeling) নিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। সুযোগ সুবিধা যত কম থাকবে 'আসাবিয়্যাহ' সামগ্রিক সংহতি (Group Solidarity) তত দৃঢ় হবে। এটি একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার হেফাজতের জন্য আবশ্যকীয়। এখানে একজন শাসক কোনো রাজা বা লর্ডের চেয়েও বেশি কিছু। কারণ তাকেও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করতে হয়।

দ্বিতীয় ধাপে একজন শাসক তার ক্ষমতাকে এককেন্দ্রিক করতে সক্ষম হন। ফলে তিনি একটি সফল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। একচ্ছত্র ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তিনি তার চারপাশের ক্ষমতার অংশীদারদেরকে ধ্বংস করেন, যারা তাকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করেছে। এরপর তিনি আমলা ও ব্যবসায়ীদেরকে হাত করেন, যারা তার অনুগত কিন্তু ক্ষমতা প্রত্যাশী নয়। এরা গোষ্ঠীর অথবা ধর্মেরও নয়। ফলে 'আসাবিয়্যাহ'-র সামাজিক মজবুতি (Social Cohesion) নষ্ট হয়ে যায়।

তৃতীয় ধাপে শাসকশ্রেণী নিজেদের আরাম-আয়েশের প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করেন। রাজ্যের কোষাগারে প্রচুর রাজস্ব আসতে থাকে। ফলে শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিলাসিতা দেখা দেয়। তারা নিজেদের আরাম আয়েশের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। নাগরিকদের সুযোগ সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট, পানশালা, সরাইখানা, চিত্তবিনোদন

কেন্দ্র, পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়। সর্বত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কারুশিল্প, চারুকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। শাসক ও জনগণ সকলেই শান্তি-সমৃদ্ধি ভোগ করতে থাকে।

উপরোক্ত তিন ধাপেই শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী, স্বাধীন ও সৃষ্টিশীল হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি তাদের ক্ষমতাকে আরো মজবুত ও স্থায়িত্ব দেয় ।

চতুর্থ ধাপ হলো পতনের প্রথম ধাপ। রাজ্যে উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ফলে সর্বত্র বিলাসিতায় ছেয়ে যায়। শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো প্রকার প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হওয়ায় তারা ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী ধরে নেয়। এই ধাপের স্থায়িত্ব নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার ক্ষমতা ও দৃঢ়তার উপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ সম্পর্কে বেখবর থাকে। জনসাধারণের আরামপ্রীতির ফলে উৎপাদনবিমুতা তৈরি হয়। শাসকগোষ্ঠীর বিলাসিতা, বিপুল রাজকর্মচারীদের বেতন ও জনগণের আরাম আয়েশে অর্থ যোগান দিতে গিয়ে জনগণের উপর করবৃদ্ধি করা শুরু করে। ফলে উৎপাদনে কমতি দেখা দেয়। শাসকশ্রেণী ও জনগণের বিলাসিতায় যোগান দিতে ব্যর্থ হয়ে এক পর্যায়ে এই চতুর্থ ধাপেই পতন শুরু হয়ে যায়।

আর পঞ্চম ধাপ হলো রাষ্ট্রের পতনের চূড়ান্ত ধাপ। এই ধাপে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ শাসকগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে চলে যায়। শাসকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার সমগোত্রীয়দেরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ফলে সাম্রাজ্য টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় 'আসাবিয়্যাহ' অবশিষ্ট থাকে না। ফলে আরেকটি গোষ্ঠী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় যাদের মধ্যে 'আসাবিয়্যাহ' শক্তিশালী থাকে (Stowasser 1984, 186-187) ।

সরাসরি নিজ জবানীতে ইতিহাস বর্ণনা

ইবনে খালদুন সাধারণ গবেষকদের মত শুধু বই-পুস্তক, দলীল-দস্তাবেজ ও শ্রুতিনির্ভর ইতিহাসবিদ ছিলেন না। তিনি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে একটি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তার রচিত ইতিহাসের প্রতিটি পর্বে নিজের সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। এ কারণে বিশ্বইতিহাস রচনার বর্ণনাভঙ্গিতে নিজের জবানীর ব্যবহার করেছেন। ইতিহাস গ্রন্থের পাশাপাশি তিনি আত্মজীবনীও রচনা করেছেন, যা ইতিহাসের অন্যতম উৎসও বটে।

একাধিক সময়ে বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে তুলনা

ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সূক্ষ্ম অনুধাবনের জন্য ঐতিহাসিকদের অবশ্যই ঘটনার স্বাভাবিক অবস্থা অবগত হতে হয়। অতঃপর বিশেষ ঘটনার সাথে স্বাভাবিক পরিস্থিতির তুলনা করতে হয়। এরপর কাজ হয় অন্য যেকোনো সময়ে একই রকম ঘটনা ঘটে থাকলে তার ফলাফলের সাথে এই ঘটনার তুলনা করা। যখন তিনি এই দু' স্তর পার হয়ে যাবেন তখন তিনি ঘটনার যৌক্তিকতা ধরতে পারবেন যে, এটি সত্য নাকি মিথ্যা (Jubouri 2004: 421) ।

ইবনে খালদুন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ১০ শতাব্দী ও তার জীবনীকাল ১৪শ শতাব্দীর ইসলামী বিশ্বের বৈসাদৃশ্যগুলোর উপর আলোকপাত করেন। ১০ম শতাব্দী হতে তিনি বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ইতিহাসবিদকে ভিত্তি হিসেবে বেছে নেন। তারা হলেন 'আল মাস'উদী, যিনি (مروج الذهب ومعادن الجوهر / Meadows of Gold and Mines of Gems) নামক বিখ্যাত কিতাবের গ্রন্থকার এবং আবু উবাইদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আযীয আল-বাকরীকে (১০১৪-১০৯৪), যিনি (كتاب المسالك والممالك / Book of Highways and Kingdoms) নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

ইতিহাস দর্শনে ধর্মকে আলাদা করে দেখা

ইবনে খালদুন ইতিহাস দর্শন চর্চায় ধর্মের অস্তিত্বকে আলাদা করতে চেষ্টা করেছেন। কারণ, ধর্মীয় কারণে ইতিহাসে নিরপেক্ষতা ও বিশুদ্ধতার ঘাটতি তৈরি হয়। ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তথ্যের যাচাই না করে তাফসীরকারকগণ অনেক ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হয়েছেন। ইবনে খালদুন তিনটি জগতের অস্তিত্ব চিহ্নিত করেন। ১. ইন্দ্রিয় জগৎ ২. বুদ্ধিবৃত্তির জগৎ ৩. ফেরেশতা ও আত্মাসমূহের জগৎ। আমরা এই তিন জগতের প্রথমটিতে আমাদের অবস্থান, তাই আমাদেরকে বাহ্যিক কারণ নিয়েই কাজ করতে হয়। মানুষ চিন্তাশক্তির কারণে প্রাণী হতে আলাদা। এই চিন্তাশক্তির দ্বারা আমরা আমাদের ভেতরকার আত্মার অস্তিত্ব টের পাই। দ্বিতীয় জগৎ হলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎ। এর দ্বারা মানুষ অন্যান্য সবকিছু উপলব্ধি করতে পারে। আর তৃতীয় জগৎ হলো সবকিছুর উর্ধ্বে যা ফেরেশতা ও আত্মাদের। এর বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। আমরা এর কোনো কিছুই মনুষ্য ক্ষমতাবলে প্রমাণ করতে পারি না; বরং এক্ষেত্রে আমরা আমাদের ধর্মের নির্দেশনাকে বিশ্বাস করি। তিনি সব নবীকে সাধারণ মানুষ হতে আলাদা করেছেন (Jubouri 2004: 423-424; Arnason and Stauth 2004:38)। তিনি সত্য ও জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পৌঁছতে বিমূর্ত জ্ঞানের ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিলেন (Katsiaficas, 1999:49) ।

কারণ ও ফলাফল (Causuality; Cause and Effect) **এবং আল্লাহর পরিকল্পনা, এদুয়ের মাঝে ভারসাম্য স্থাপন**

কোনো ঘটনার পেছনে কারণ এবং ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্ককে 'কজুয়ালিটি' বলা হয়। ইবনে খালদুনের মতে, যে কোনো বিষয় ঘটা বা হওয়ার পিছনে কোনো না কোনো কারণ নিহিত রয়েছে এবং এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাস দর্শনে কারণ ও ফলাফল সূত্রের প্রয়োগ করেছেন, যাতে ধর্মীয় ভাবাবেগ হতে ইতিহাসকে পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি ঐতিহাসিক ঘটনাবলি হতে অধিবিদ্যা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বাদ দেয়ার জন্য পরিবর্তনশীল বড় বড় ঘটনাবলির পিছনে তিনি পার্থিব কারণ আবিষ্কার করেছেন। এভাবে তিনি আমাদের কাছে একটি 'ব্যাখ্যামূলক উপায় 'hermeneutical tool' এর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, যাকে পরবর্তীতে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান 'historicism' হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। তিনি যেমনি প্রতিটি ঘটনার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দান করেছেন, পাশাপাশি উক্ত ঘটনা সম্পর্কে 'আল্লাহর উত্তম পরিকল্পনা' বাক্যের ব্যবহার করেছেন। তিনি কারণ ও ফলাফলের (Causuality) ব্যবহার ঘটিয়ে ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করতেন।

তিনি পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার পিছনে আল্লাহর হস্তক্ষেপকে যৌক্তিক কারণের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি তার তত্ত্বকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, যখন কোনো সাম্রাজ্যের উপর বিপর্যয় নেমে আসে তখন তা আর উধাও হয়ে যায় না। এরপর তিনি জৈবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিয়ামসমূহের একটি তালিকা করেন। এরপর তিনি প্রয়োজনীয় যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে তার পাঠকদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন এবং তা আল্লাহর ইচ্ছার ও পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করে দেন। তিনি বলেন, This should be considered, and one should not disregard the wise planning that God employs in having His creation follow its course toward the destiny, He has determined for it ''এটি অবশ্যই কারো পক্ষে অগ্রাহ্য করা উচিত নয় যে, ভাগ্যনির্ধারিত প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহ তার সৃষ্টিকে রাস্তা করে দেন এবং তা অনুসরণ করানোর জন্য অবশ্যই আল্লাহর বিজ্ঞ পরিকল্পনা থাকে'' (Ibn Khaldun, 1981:363 [2:118]) ।

নগর সভ্যতার পেছনে তিনি পার্থিব কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক মন্দা, সামাজিক অবক্ষয় ও যাযাবরদের আক্রমণকে। এই পতনের কারণসমূহকে তিনি 'আল্লাহর পরিকল্পনা' হিসেবে দেখিয়ে দু'য়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ 'আল্লাহর পরিকল্পনা' মাফিক নগরের পতনের জন্য হঠাৎ কোনো দুর্যোগ বা

বিপর্যয়কে কারণ হিসেবে দেখানোর প্রয়োজন হয়নি (Ibn Khaldun, 1981:353–58 [2:103–110]) ।

যৌক্তিক অনুমান হতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

তার গবেষণা পদ্ধতি ছিলো অন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের থেকে আলাদা। তিনি যৌক্তিক অনুমানের (logical hypothesis) সাথে গবেষণামূলক তথ্যের ব্যবহার করে ফলাফলে পৌঁছতে চেষ্টা করতেন। কখনো অসমর্থিত উপসংহারে বিশ্বাস করতেন না। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) প্রকাশ করেন যে, 'প্রাচ্য সমাজের মানুষ ইউরোপীয়দের তুলনায় কম মেধাবী এবং ইউরোপীয়রা জিনগতভাবে অনেক বেশি বিচারবুদ্ধির অধিকারী' (Abdalla 2007:62) ।

অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন

ইবনে খালদুন মনে করতেন, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক (dialectic relation) বিদ্যমান। তার বিখ্যাত প্রবাদ হলো, 'অতীত ও বর্তমান হলো পানির মত'। জলপ্রপাত থেকে মাটিতে পানি পড়ে নদীতে চলে যায়, তারপর বাষ্পীভূত হয়, তারপর আবার বৃষ্টির মাধ্যমে জমিনে ফিরে আসে (Cabiri 2006: NP) ।

মানবসভ্যতার বিকাশে ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব

ইবনে খালদুন দেখিয়েছেন, কীভাবে পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থানের ভিন্নতার কারণে মানবসভ্যতার বিকাশে তারতম্য তৈরি হয়। তিনি পৃথিবীর ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়ে দেখিয়েছেন, কোন অঞ্চলে জনবসতি কম ও বেশি হওয়ার কারণ কী হতে পারে। তিনি বলেন,

> "...জল নিষ্কাশিত পৃথিবীর যে অংশে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তাতে জনবসতিপূর্ণ এলাকা অপেক্ষা জনমানবহীন এলাকাই অধিক।... জনবসতিপূর্ণ এলাকাটি একটি সমতল বৃত্তাকারে দক্ষিণ থেকে ক্রমশ উত্তর দিকে ভূ-বিষুব রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। ...বিষুব রেখার উত্তরদিকস্থ জনবসতি অঞ্চল মাত্র চৌষট্টি অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর অবশিষ্ট অংশ অতিরিক্ত শীত ও জড়তার জন্য জনবসতিশূন্য। যেমন তার দক্ষিণদিকস্থ অঞ্চল অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্য জনবসতিহীন"। (Khaldun 2015: 130-132)

ইবনে খালদুন ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর সর্ব দক্ষিণ দিক অত্যন্ত উষ্ণ এবং সর্ব উত্তর দিকে অতি শীতপ্রধান হওয়ার কারণে এসব অঞ্চলে জীবনযাপন কষ্টকর হওয়ায় মানববসতি অত্যন্ত কম। আর এ দুঅঞ্চলের মধ্যবর্তী যে

অঞ্চল তা তুলনামূলক আরামদায়ক হওয়ায় এসব জায়গায় জনবসতি বেশি। এসব জায়গায় খাদ্য, ফলমূল, পশুপালন, পোষাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বস্তু বেশি উৎপন্ন হয়। এসব কারণে ঐসকল অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, স্থাপত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে। এসব অঞ্চলের অধিবাসী মানুষের শরীরের গঠন, গায়ের রঙ, স্বভাবচরিত্র ও ধর্মবোধ প্রভৃতির দিক থেকে অধিকতর সমভাবাপন্ন। এমনকি নবুওয়াতও এসব অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। তিনি বলেন, "আমরা দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তীয় অঞ্চলগুলোতে নবী প্রেরণের কোনো সংবাদ জানতে পারিনি। এর কারণ এ যে, নবী ও রাসূলগণ মানব জাতির মধ্যে দৈহিক গঠন ও চরিত্রের দিক থেকে অধিকতর পরিপূর্ণতা বিশিষ্ট হয়ে থাকেন" (Khaldun 2015: 175)। জলবায়ু, পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির মানসিকতা ও নৈতিকতার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে মন্টেস্কু যে ধারণা দিয়েছেন তা সম্ভবত ইবনে খালদুন হতে ধার করা (Gates 1967) ।

বায়ু প্রবাহের ভিন্নতার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে মানব চরিত্রের ভিন্নতা

ইবনে খালদুন ইতিহাস গবেষণা করতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের মানসিকতার উপর বায়ুর প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, উষ্ণ অঞ্চলের মানুষ উষ্ণ হাওয়া প্রবাহের ফলে অত্যন্ত আনন্দপ্রবণ হয়ে থাকে। তিনি সূদানের লোকদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন, যারা সামান্যতেই আনন্দিত হয়ে ওঠে। যেকোনো উপলক্ষেই আনন্দিত হয়ে নৃত্য করে থাকে। মূলত আফ্রিকার বেশিরভাগ অঞ্চলের মানুষদের মধ্যেই এরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । তবে লেখক দেখিয়েছেন, মাগরিবের ফাস (ফেজ, বর্তমান মরক্কোর একটি শহর) এলাকা চতুর্দিক থেকে শীতল পাহাড়ী এলাকা ঘিরে রাখার কারণে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিষণ্নতা বেশি দেখা যায় (Khaldun 2015, 181)। বর্তমানে ইউরোপীয়ান দেশগুলোতে আত্মহত্যার হার বেশি পরিমাণে হওয়া ইবনে খালদুনের এ ব্যাখ্যাকে সত্যায়ন করে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের প্রাচুর্য প্রভৃতির ফলে মানবচরিত্রে সৃষ্ট প্রভাবের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয়

পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমান ফসল ও খাদ্য উৎপন্ন হয় না। অধিক মশলাযুক্ত, আর্দ্র ও পচনশীল খাবার গ্রহণ করে যেসব অঞ্চলে সেখানকার মানুষের শরীর মেদযুক্ত হতে দেখেছেন। অতিরিক্ত আহারে মানুষের মধ্যকার কোমলতা ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ কমে যায়। এ শ্রেণীর মানুষ নগর ও পল্লী অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। এর তুলনায় মরুচারী বেদুইন ও যাযাবরগোষ্ঠীর মানুষেরা যারা শুধুমাত্র মাংস ও দুধের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে তারা অধিকতর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। আর কম

খাবার গ্রহণকারী ও অনাহারীদের মধ্যে বেশি ধার্মিকতা পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে নগরাঞ্চলের মানুষের তুলনায় গ্রাম ও মরু অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধার্মিকতা বেশি দেখা যায় (Khaldun 2015: 182-184)। সম্ভবত এ কারণেই ইসলামে পরিমিত খাদ্য গ্রহণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে ধার্মিকতা শাণিত করার জন্য রোজা রাখার বিধান রয়েছে।

উপসংহার

ইবনে খালদুন তার অমর গ্রন্থের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাস চর্চার পদ্ধতিতে বিশুদ্ধতা আনার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একজন ইতিহাসবিদের মধ্যে কিছু গুণাবলি থাকা আবশ্যকীয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনার জন্য একজন ইতিহাসবিদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান এবং মানব প্রকৃতি অনুধাবন ক্ষমতা থাকা আবশ্যক হিসেবে দেখেছেন। এছাড়াও তাঁর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং স্থান-কাল ভেদে এর ভিন্নতা, বিভিন্ন জাতির সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের জীবনধারা, নীতি-নৈতিকতা, উপার্জন, মতবাদ সম্পর্কিত জ্ঞান, বর্তমান সময় সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান এবং অতীতের সাথে তুলনা করার সক্ষমতা, রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়সমূহের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত জ্ঞান, এগুলির ঘোষিত নিয়ম-নীতিমালা ও ইতিহাসের মূল ঘটনাবলি প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

Bibliography

Abdalla, Mohamad. 2016. Ibn Khaldun. First Edition. New Jersey: John Wiley & Sons

Abdalla, Mohamad. 2007. "Ibn Khaldun on the fate of Islamic science after the 11th century." Islam & Science 5(1).

Abdullahi, Ali Arazeem and Bashir Salawu. 2012. “Ibn Khaldun: A Forgotten Sociologist?” SouthAfrican Review of Sociology 43(3): 24–40.

Abdullahi, Ali Arazeem and Bashir Salawu. 2012. “Ibn Khaldun: A Forgotten Sociologist?” South African Review of Sociology 43(3): 24–40.

Abid El-Cabiri, Muhammed. 2006 ‘Importance of Ibn Khaldun’s Doctrine of Society and History Today’, conference paper, 18 September 2006, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul.

Ahmed, A. 2002. Ibn Khaldun's understanding of civilizations and the dilemmas of Islam and the West today. The Middle East Journal, 20-45.

Ahmed, Akbar. 2002. Discovering Islam. London: Routledge.

Alatas, Syed Farid. 2006. “Ibn Khaldun and Con-

Alatas, Syed Farid.2006. “Ibn Khaldun and Con-temporary Sociology.” International Sociology21: 782–95

Al-Jubouri, Imadaldin. 2004. History of Islamic Philosophy, with view of Greek Philosophy and early history of Islam. England: Bright Pen.

Almaany. 2019. Accessed April. 06, 2019. https://www.almaany.com/

al-Masʿūdī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn al-Ḥusayn. 1861. Murūj al-dhahab wa maʿādin al-jawāhir. Paris: NP.

Baali, F. 1995. Asabīyah.The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol 1, Oxford University Press.

Çaksu, Ali. 2017. "Ibn Khaldun and Philosophy: Causality in History." Journal of Historical Sociology 30:1, 27-42.

Collins, R. 1979. The credential society: an historical sociology of education and stratification. New York: Academic Press.

Early Modern History, 9(1-2).

Hawker, S., 2006. Little Oxford English Dictionary. Oxford University Press.

Ibn Khaldun, W. A.1981. In K. Shaḥādah (Ed.), Muqaddimah Tārīkh Ibn Khaldūn. Beirut: Dār al-Fikr.

Islam, S., Hossain, A. 2017. Understanding the Society and Governance of Bangladesh through the Lens of Ibn Khaldun. Open Journal of Social Science, 5: 194- 215.

Issawi, C.P. 1987. An Arab Philosophy of History: Selections from the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406). Indiana University: Darwin Press.

Katsiaficas, George. 1999. "Ibn Khaldun: A Dialectical Philosopher for the 21st Century",

Khaldūn, Ibn,.1951. al-Taʿrīf bi-Ibn Khaldūn wa-riḥlatihi gharban wa-sharqan.Cairo: Lajnat al-Ta'līf wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr

Khaldun, Ibn,.1967. Al Muqaddimah. Translated by Franz Rosenthal, Edited By N.J.

Khaldun, Ibn. 1958. The Muqaddimah: an introduction to history. Vol 1. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Khaldun, Ibn. 2015. Al Muqaddimah. Vol.1. Translated By Koraishi, G. S. Dhaka: Dibyaprakash.

Lacoste, Y. 1984. Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third World. Verso: University of Michigan.

Lane, E.W.1968. Arabīc-English Lexicon. Vol. 2, Lebanon : Librairie Du Liban. Manzur, M.M. 1997. Lisan al-Arab. Mujallad 1, Bayrut :Dar al-Sadr.

Mahdi, Muhsin. 2006. Ibn Khaldun's Philosophy of History: A Study of the Philosophical Foundation of the Science of Culture. Kuala Lumpur: Other Press.

Matar, Nabil. 2005. "Confronting Decline İn Early Modern Arabic Thought", Journal of

Mercan, Muhammed Hüseyin. 2016. Transformation of the Muslim World in the 21st Century. Cambridge Scholars Publishing;

New Political Science, 21(1).

Stauth, G. 2007. Asabiyya. The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Blackwell Pub. Ltd., 180-185

STOWASSER, Barbara,. 1984. Ibn Khaldun's Philosophy of History: the rise and fall of states and states. Conference Paper, Ankara University.

temporary Sociology." International Sociology 21: 782–9

Toynbee. A. J. 1935. A Study of History. London: oxford University Press.

Warren E. Gates, 1967. The Spread of Ibn Khaldûn's Ideas on Climate and Culture, Journal of the History of Ideas. 28: 3. 415-422